দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ০৭-০৩-২০২৪ (পৃঃ ০১,০৬)

বাংলাদেশে চাহিদার চেয়েও বেশি চাল উৎপাদিত হচ্ছে

জনসংখ্যার তথ্য সঠিকভাবে উঠে আসছে কি না, প্রশ্ন ধান বিজ্ঞানীদের

নিজামুল হক

গত বছরে বাংলাদেশে চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩ কোটি ৭৭ লাখ মেট্রিক টন। এর বিপরীতে চালের উৎপাদন ছিল ৪ কোটি ১৩ লাখ মেট্রিক টন। কৃষি বিভাগ বলছে, এভাবে ২০১৮ সাল থেকেই বাংলাদেশে চাহিদার চেয়ে বেশি পরিমাণ চাল উৎপাদিত হচ্ছে। চলতি বছরে উৎপাদনের এই ধারাহিকতা রক্ষা হয়েছে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) পলিসি গবেষণার প্রজেকশন অনুযায়ী, ২০৩০ সালে বাংলাদেশে ৪ কোটি ৬৯ লাখ টন, ২০৪১ সালে ৫ কোটি ৪১ লাখ টন এবং ২০৫০ সালে ৬ কোটি ৯ লাখ টন চালের প্রযোজন হবে। ব্রি-এর মহাপরিচালক ড. শাহজাহান কবীর এক তথ্যে দেখিয়েছেন, ২০৩০ সালে ৪২ লাখ টন, ২০৪০ সালে ৫৩ লাখ টন এবং ২০৫০ সালে ৬৫ লাখ টন চালে উদ্বৃত্ত থাকবে। এই বাড়তি উৎপাদন আমাদের যে কোনো ঝুঁকি মোকাবিলায় বাফার স্টক হিসেবে কাজ করবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, দেশে মাথাপিছু দৈনিক চাল গ্রহণের পরিমাণ ৩২৮ দশমিক ৯ গ্রাম হয়েছে। শহরাঞ্চলে মাথাপিছু চাল গ্রহণের পরিমাণ ২৮৪ দশমিক ৭ গ্রাম, যা জাতীয় গড় থেকে ১৩ দশমিক ৪৪ শতাংশ কম। ১৭ কোটির মানুষের প্রতিদিনের হিসাব ধরে বছরে প্রয়োজন হয় প্রায় ২ কোটি ৬০ লাখ টন চাল। শুধু ভাত হিসেবে এ চাল মানুষ গ্রহণ করে। এর বাইরে বিভিন্ন পোলট্রি ফিড, বীজসহ অন্যান্য প্রয়োজনে চাল ব্যবহার হয় ১ কোটি টন। সব মিলে প্রয়োজন ৩ কোটি ৬০ লাখ টন। কিন্তু গত বছরে উৎপাদিত হয়েছে ৪ কোটি ১৩ লাখ টন। ব্রি-এর কর্মকর্তারা বলেছেন, ব্রি ইতিমধ্যে রাইস ভিশন ২০৫০ প্রণয়ন করেছে; যাতে ২০৩০, ২০৪১ এবং ২০৫০ সালে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বিপরীতে চালের উৎপাদন প্রক্ষেপণ করা হয়েছে এবং তা অর্জনে ব্রি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। ২০৩০ সালের মধ্যে উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে কৌশলপত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি হারে আমাদের ধান উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, যা নিশ্চিত করে যে আমরা খাদ্যে উদ্বৃত্ত। **পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১**

'বাংলাদেশে চাহিদার চেয়েও

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তাহলে এত চাল কোথায় যায়,

আমদানি কেন করতে হয় : তাহলে প্রশ্ন উঠেছে এরপরও কেন সরকারকে চাল আমদানি করতে হয়। এ বিষয়ে ধান বিজ্ঞানীরা বলছেন, দেশে ১২ লাখ রোহিঙ্গা রয়েছে। তাদের তথ্য আদমশুমারিতে যুক্ত হয়নি। এরা যে ভাত খায়, সে চাল আমাদের দেশেই উৎপাদিত হয়। একটি অংশ রাখতে বীজের জন্য রাখতে হয়। নানা কারণে চালের অপচয় হয়। ব্যক্তিগতভাবে অনেক কৃষক নিরাপত্তার জন্য বাড়িতে চাল মজুত করেন, যেটি হিসাবেও নেই। ব্যবসায়ীদের কাছেও মজুত থাকে। তথ্য বলছে, গত জুলাই মাসের পর দেশে আর চাল আমদানি করতে হয়নি।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, চালের হিউম্যান কনজাম্পশন (সরাসরি ভাত) ছাড়াও নন-হিউম্যান কনজাম্পশন (অন্যান্য কাজে) আছে। হিউম্যান কনজাম্পশন হিসাবে উদ্বৃত্ত ঠিকই আছে। তবে নন-হিউম্যান কনজাম্পশনও বাড়ছে। ১৫ থেকে ২০ শতাংশ চাল নন-হিউম্যান কনজাম্পশনে ব্যয় হয়ে যায়। ঝুঁকি মোকাবিলা ও বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার চাল আমদানি করে থাকে। ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক ও বিশিষ্ট ধান বিজ্ঞানী ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস ইত্তেফাককে বলেন, আগে যেখানে হেক্টরে পাঁচ টন চাল উৎপাদন হতো। এখন হেক্টরে সাত টনও চাল উৎপাদন হয়। উৎপাদন নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তবে জনসংখ্যা নিয়ে আমার প্রশ্ন আছে। সব মানুষের তথ্য কি উঠে আসছে ? গণনার বাইরেও অনেক মানুষ রয়ে গেছে। যেমন আমার বাড়িতেও গণনার জন্য কেউ আসেননি। এমন অনেক আছে।

ঝুঁকি কতটুকু? : প্রতিনিয়ত গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১১৫টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এতে আগের চেয়ে ফলন ও উৎপাদন বাড়ছে। অনাবাদি জমি আবাদের আওতায় আনা হচ্ছে। এর পরও ধান উৎপাদনের নানা ঝুঁকিও রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন বড় প্রভাব হিসাবে কাজ করবে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবাদি জমির পরিমাণ প্রতিনিয়ত কমে আসছে। ভবিষ্যতে কৃষক পর্যায়ে গড় ফলন যদি পাঁচ টন/হে. করা যায় সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ৬২ লাখ ৯ হেক্টর জমি ধানের চাষের জন্য নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় উৎপাদনের ওপর প্রভাব পড়বে।